পরমাণু পাঠ
অ আ ক খ

প্রিয় বন্ধু!

'পরমাণু পাঠ অ আ ক খ' বইটি তোমার চার দিকে যা কিছু রয়েছে, যা কিছু ঘটছে তা সম্পর্কে তোমাকে জানতে ও বুঝতে সাহায্য করবে। তুমি জানতে পারবে কোন বৈজ্ঞানিক নিয়ম অনুসরণ করে এ সকল কিছু ঘটছে। এই বইটি তোমাকে নিউক্লিয়ার ফিজিক্সের আকর্ষণীয় জগতে নিয়ে যাবে। মানুষ অনেক আগে থেকেই প্রকৃতি প্রদত্ত আশির্বাদকে নিজের কল্যাণে ব্যবহার করতে শিখেছে। এর মধ্যে অবশ্যই উল্লেখযোগ্য হলো সাশ্রয়ী ও প্রায় অশেষ শক্তির উৎসের আবিষ্কার। বর্তমানে এই শক্তি উৎপাদিত হচ্ছে পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলো থেকে। তবে ভবিষ্যতে আমরা আরো উন্নত থার্মোনিউক্লিয়ার কেন্দ্র থেকে বিদ্যুৎ পাওয়ার পরিকল্পনা করছি। যখন বড় হবে কে জানে হয়তো তুমি এর চাইতেও কার্যকরী কোন কিছু আবিষ্কার করতে সক্ষম হবে।

কিন্তু এ জন্য যা সকলচেয়ে বেশি প্রয়োজন, তা হলো পর্যাপ্ত জ্ঞান। বিশেষ জ্ঞান ছাড়া তোমার পক্ষে বুঝা কঠিন হবে– কিভাবে পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রে পরমাণুর নিউক্লিয়াসের বিভাজনের মাধ্যমে এনার্জি পাওয়া যায়। অধিকাংশ লোকের কাছেই এটি একটি রহস্য। কিন্তু এই বইটি পড়ার পর তোমার কাছে সকল কিছুই পরিষ্কার হয়ে যাবে।

চলো এবার নিউক্লিয়ার ফিজিক্সের বিস্ময়কর জগতে ভ্রমণের উদ্দেশ্যে যাত্রা করা যাক। তুমি জানতে পারবে কি দিয়ে পরমাণু তৈরি হয়; এটির নিউক্লিয়াস কি বিকিরণ করে এবং এর মধ্যে কি বিশাল পরিমাণ এনার্জি লুকিয়ে আছে। একই সঙ্গে পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের কার্যক্রম সম্বন্ধে অবশ্যই জানতে পারবে। পারিপার্শ্বিক প্রকৃতি, যা ছাড়া আমাদের জীবন কল্পনাই করা যায় না তা সম্পর্কে আরো বিস্তারিত জ্ঞান লাভ করতে পারবে তুমি। যাত্রা শুভ হোক!

দূর যাত্রার শুরু

প্রিয় বন্ধু, বাবা-মা বা স্কুলের বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে তোমার কি কোন নৌকা বা জলযানে ভ্রমণের সুযোগ হয়েছে? মনে করে দেখ ঐ সময় কি প্রবল বেগে বাতাস বইছিল, ঢেউয়ের আঘাতে দুলছিল তোমার বাহনটি, সূর্যের আলোয় কি দারুণ চিক চিক করছিল উছলে ওঠা জলের কণাগুলো। চলো এবার আমরা বঙ্গোপসাগর অভিমুখে পদ্মা নদীতে আমাদের যাত্রা শুরু করি।

কল্পনা করে আমরা নদীতে ভেসে চলেছি। সকলুজ প্রান্তর চিরে একে বেঁকে বয়ে চলেছে নদী, কোথাও বা পলি জমে চর জেগে উঠেছে, কোথাও বা সেই অতি পরিচিত প্রমত্তা পদ্মা। তুমি জাহাজের ডেকে দাঁড়িয়ে আছ। মনে কর, তুমি এই জাহাজের ক্যাপ্টেন এবং তুমি নিজেই জাহাজটি পরিচালনা করছ।

এবার কল্পনা কর, ধীরে ধীরে নদীর তীর দৃশ্য থেকে সরে যাচ্ছে এবং তুমি জাহাজ নিয়ে এখন ভারত মহাসাগর দিয়ে দূরবর্তী দেশের উদ্দেশে যাত্রা শুরু করেছ। ক্ষণে ক্ষণেই অগাধ জলরাশি ভেদ করে লাফিয়ে উঠছে ডলফিন। সূর্যের আলোয় তার পাখাগুলো চিক চিক করছে। কখনো বা লাফিয়ে উঠছে উড়ন্ত মাছ। শক্তিশালী ইঞ্জিন সমুদ্রের নির্জনতা ভেঙ্গে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে জাহাজটিকে।

তুমি তোমার লক্ষ্যে অনেকদূর এগিয়ে গেছো ..... হঠাৎ করেই সিনিয়র মেকানিক এসে জানালো যে জাহাজের তেল প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। কি হবে এখন?

তোমার হয় তো মনে আছে যে, ছাড়ার পূর্বে একটি স্বয়ংক্রিয় বার্জ এসেছিল জাহাজের কাছে। বার্জটিতে রাখা ছিল উজ্জ্বল রংয়ের ড্রাম, যার গায়ে বড় অক্ষরে লিখা, 'বিপদজনক'। এটি ছিল আসলে রিফুয়েল ট্যাংকার। পদ্মা নদীতে ভ্রমণকালে প্রয়োজন অনুসারে রিফুয়েল করা সম্ভব; কিন্তু সমুদ্রে সহসা এ জাতীয় রিফুয়েল ট্যাংকারে দেখা মিলেনা।

কিছুই করার নেই। যাত্রা ভঙ্গ করে নিকটবর্তী কোন নৌবন্দরে পৌছতে হবে রিফুয়েলিংয়ের জন্য। এমনি করেই এক নৌ বন্দর থেকে আরেক নৌ বন্দরে পৌছতে গিয়ে প্রচুর সময়ের অপচয় ঘটছে। তোমার জাহাজটি বলতে গেলে অদৃশ্য দড়ির সাহায্যে নৌ বন্দরের সঙ্গেই বাঁধা থাকছে।

কিন্তু দূরবর্তী সমুদ্র যাত্রায় এই ইঞ্জিন দিয়ে কাজ হবে না। এই জাতীয় ইঞ্জিনের সমস্যা অনেক। ইঞ্জিনগুলো চালাতে প্রয়োজন হয় তেলের। তেল পোড়াতে খারাপ লাগারই কথা; কারণ রসায়নবিদরা এই তেল থেকেই অনেক প্রয়োজনীয় মূল্যবান জিনিস তৈরি করতে সক্ষম যেমন প্লাস্টিক, ঔষধ, রং, কাপড়, কৃত্রিম আঁশ এমন কি সুগন্ধি ..... অতএব, যখন জাহাজ চালাতে গিয়ে এই তেল পুড়তে হয় তখন আমরা এ সকল প্রয়োজনীয় জিনিসগুলো প্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত হই। এখন কী করণীয়?হতাশ হওয়ার কিছুই নেই। আমরা জানি, আমাদের রয়েছে পারমাণবিক শক্তিচালিত আধুনিক জাহাজ, যেগুলো বছরের পর বছর ধরে চলতে পারে কোন রিফুয়েলিং ছাড়াই এবং এর জন্য কোন নৌ বন্দরে গিয়ে রিফুয়েলিংয়ের জন্য সময় নষ্ট করতে হয় না। জাহাজে যে পরিমাণ পারমাণবিক জ্বালানি প্রয়োজন হয় তা অতি সামান্য।

কিছুই করার নেই। যাত্রা ভঙ্গ করে নিকটবর্তী কোন নৌবন্দরে পৌছতে হবে রিফুয়েলিংয়ের জন্য। এমনি করেই এক নৌ বন্দর থেকে আরেক নৌ বন্দরে পৌছতে গিয়ে প্রচুর সময়ের অপচয় ঘটছে। তোমার জাহাজটি বলতে গেলে অদৃশ্য দড়ির সাহায্যে নৌ বন্দরের সঙ্গেই বাঁধা থাকছে।

কিন্তু দূরবর্তী সমুদ্র যাত্রায় এই ইঞ্জিন দিয়ে কাজ হবে না। এই জাতীয় ইঞ্জিনের সমস্যা অনেক। ইঞ্জিনগুলো চালাতে প্রয়োজন হয় তেলের। তেল পোড়াতে খারাপ লাগারই কথা; কারণ রসায়নবিদরা এই তেল থেকেই অনেক প্রয়োজনীয় মূল্যবান জিনিস তৈরি করতে সক্ষম যেমন প্লাস্টিক, ঔষধ, রং, কাপড়, কৃত্রিম আঁশ এমন কি সুগন্ধি ..... অতএব, যখন জাহাজ চালাতে গিয়ে এই তেল পুড়তে হয় তখন আমরা এ সকল প্রয়োজনীয় জিনিসগুলো প্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত হই। এখন কী করণীয়?হতাশ হওয়ার কিছুই নেই। আমরা জানি, আমাদের রয়েছে পারমাণবিক শক্তিচালিত আধুনিক জাহাজ, যেগুলো বছরের পর বছর ধরে চলতে পারে কোন রিফুয়েলিং ছাড়াই এবং এর জন্য কোন নৌ বন্দরে গিয়ে রিফুয়েলিংয়ের জন্য সময় নষ্ট করতে হয় না। জাহাজে যে পরিমাণ পারমাণবিক জ্বালানি প্রয়োজন হয় তা অতি সামান্য।

উদাহরণস্বরূপ পুরু বরফের মধ্যদিয়ে ১০০ দিন চলাচল করতে একটি আধুনিক আইস ব্রেকারের দুটি পারমাণবিক চুল্লির জন্য প্রয়োজন হয় প্রায় ১৫ কিলোগ্রাম ইউরেনিয়াম। কিন্তু সমপরিমাণ কাজের জন্য আইস ব্রেকারের প্রয়োজন হতো ৩০ হাজার টন ডিজেল। একদিকে ১৫ কিলোগ্রাম আর অন্য দিকে ৩০ হাজার টন। ২০ লক্ষ গুণ বেশি! এত পরিমাণ ডিজেল আইস ব্রেকারে বহন করাও সম্ভব নয়! যুদ্ধের কাজে ব্যবহৃত ডুবো জাহাজের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। এটা পরিষ্কার যে, শুধুমাত্র পরমাণু শক্তিচালিত ইঞ্জিনের সাহায্যেই ডুবো জাহাজগুলোর পক্ষে মাসের পর মাস সমুদ্র বা মহাসাগরের উপরে না উঠেই দিন রাত চলাচল করা সম্ভব।

এখনতো সমাধান পেয়েই গেলাম, পরমাণু শক্তি ব্যবহার করেই আমাদের জাহাজটি পরিচালনা করব। এ জন্য যাত্রার পূর্বে জাহাজটিতে স্থাপন করব পারমাণবিক চুল্লি, যাতে কোন বিরতি ছাড়াই আমরা হোক এন্টারর্কটিকা বা হোক বিশ্ব ভ্রমণ করতে পারি।

কিন্তু পারমাণবিক চুল্লি পরিচালনার জন্য সুশিক্ষিত বিশেষজ্ঞের প্রয়োজন। এই জাহাজটি যে ক্যাপ্টেন পরিচালনা করবেন তাকেও এ বিষয়ে পুরোপুরি জানতে হবে। তুমি কি আমার সঙ্গে একমত?

প্রিয় বন্ধু প্রথমেই চলো আমরা পরমাণুর বিস্ময়কর জগতে ভ্রমণ করে আসি।

পরমাণুর গঠন কেমন

তুমি অনেক ছোট বেলা থেকেই বিভিন্নভাবে পরমাণু, পারমাণবিক শক্তি, পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র, পারমাণবিক যুগ এই শব্দগুলোর সঙ্গে পরিচিত ....।

তুমি হয় তো জানো যে, পরমাণু একটি অতি ক্ষুদ্র কণিকা– যা থেকে তৈরি আমাদের এই বিশ্বের সকলকিছু; বাতাস, যা আমরা শ্বাস প্রশাসের সঙ্গে গ্রহণ করি বা ছাড়ি, পানি যা আমরা পান করি বা যাতে গোসল করি, মাটি যার ওপর দিয়ে আমরা চলাচল করি, খাদ্য দ্রব্য, হাঁড়ি-পাতিল বাসন-কোসন, খেলনা সামগ্রী, পোশাক, বই, গাড়ি, বাড়ি, পাহাড়, মেঘ, চন্দ্র, সূর্য, তারা ..... সকল জীব জন্তু এমন কি তুমি, আমি ও সকল মানুষ।

প্রোটন

তার পরও প্রশ্ন থেকে যায় পরমাণু জিনিসটা আসলে কি? এটি দেখতে কেমন? এর ভিতরে কি থাকে?

নিউট্রন

তিনটি শব্দ আমাদের মনে রাখতে হবে যেমন 'প্রোটন', 'নিউট্রন' এবং 'ইলেকট্রন' এগুলো হচ্ছে সেই সকল ক্ষুদ্র কণিকা যা থেকে তৈরি হয় প্রতিটি পরমাণু।

এই কণিকাগুলো এতোই ছোট যে আমাদের পক্ষে এগুলোর আকার কল্পনা করা কঠিন। তারপরও চেষ্টা করে দেখা যাক। কল্পনা কর যে, হঠাৎ করেই পরমাণুর কণিকাগুলো আকারে অনেক অনেক গুণ বৃদি পেয়ে এমন হলো যে সব চেয়ে ছোট পরমাণুটি তোমার জ্যাকেটের বোতামের সমান হয়ে গেল। অনুরূপভাবে কল্পনা করা যাক যে, ছোট একটি বিড়াল ছানা পরমাণু কণিকাগুলোর মতোই অত গুণ বড় হয়ে গেল। তাহলে কি হবে? পৃথিবী ও সূর্যের মাঝে যে বিশাল স্থান রয়েছে তার মধ্যেও এই বিড়ালটির জায়গা হবে না। এই বিশালকায় বিড়ালটির কাছে সূর্যটিকে একটি মটর দানার মতোই মনে হবে।

ইলেকট্রন

যাক, এই সকল কল্পনা বাদ। প্রোটন, নিউট্রন, ইলেকট্রন এবং বিড়াল ছানাটি যেমন ছিল তেমনই থাক। কারোরি অত বড় হওয়ার দরকার নেই।

পরমাণুতে যে সকল কণিকাগুলো রয়েছে তার মধ্যে প্রোটনের ওজন ইলেকট্রনের চাইতে ২০০০ গুণ বেশি। অতএব, খুব স্বাভাবিক ব্যাপার যে, পরমাণুর কেন্দ্রে এই প্রোটনের অবস্থান। হালকা ইলেকট্রনগুলো এই প্রোটনের চারদিকে ঘুরতে থাকে, অনেকটা পৃথিবীকে ঘিরে যেমন করে উপগ্রহ আবর্তিত হয়। পরমাণুর কেন্দ্রে যা থাকে তাকে পদার্থবিদদের ভাষায় তা হচ্ছে পরমাণুর নিউক্লিয়াস।

১৯১১ সালে স্বনামধন্য ইংরেজ পদার্থবিদ আর্নেস্ট রাদারফোর্ড হঠাৎ চিৎকার করে বলে উঠলেন 'এখন আমি জানি, পরমাণু দেখতে কেমন!'

কী দিয়ে তৈরি হয় একটি সাধারণ পরমাণু? এটিতে থাকে শুধুমাত্র একটি প্রোটন ও একটি ইলেকট্রন– কোন নিউট্রন থাকে না। এটিই হচ্ছে সব চেয়ে হালকা গ্যাস হাইড্রোজেনের পরমাণু। এখনকি তুমি বুঝতে পারছ কেন হাইড্রোজেন এতটা হালকা। হাইড্রোজেন বাতাসের চেয়ে ১৫ গুণ হালকা– যার ফলে হাইড্রোজেন ভর্তি বেলুন বাতাসে অতি সহজে ভেসে বেড়াতে পারে।

এখন প্রশ্ন হলো নিউট্রন কোথায় গেল এবং এর দরকারই বা কী? হাইড্রোজেন এর নিউক্লিয়াসে যদি একটি নিউট্রন যুক্ত হয় তবে

আমরা যে পরমাণুটি পাব তাকে বিজ্ঞানিরা নাম দিয়েছেন ডিউটেরিয়াম। এটিকে ভারি হাইড্রোজেন হিসেবেও পরিচিত। এখন আমরা পরমাণুতে তিনটি কণিকা পেলাম– প্রোটন, নিউট্রন ও ইলেকট্রন।

হালকা হাইড্রোজেন পরমাণুর নিউক্লিয়াসে প্রোটনের সঙ্গে একটি নিউট্রন যুক্ত হওয়ার ফলে এটি কি পরিমাণ ভারি হলো? চলো হিসাব করে দেখা যাক। নিউট্রনের ভর প্রোটনের ভরের প্রায় সমান। এর ফলে নিউক্লিয়াস ও পুরো পরমাণুর ভর দ্বিগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে (ইলেকট্রনের ভর এতটাই কম যে– তা হিসাব না করলেও চলে)। হাইড্রোনে পরমাণুকে আরো ভারী করা সম্ভব। ডিউটেরিয়ামের নিউক্লিয়াসে অবস্থিত একটি প্রোটন ও একটি নিউট্রনের সঙ্গে যদি আরো একটি নিউট্রন যুক্ত করা যায়, তবে আমরা পাব অতি ভারী হাইড্রোজেন বা বিজ্ঞানিদের ভাষায় ট্রিটিয়াম।

ট্রিটিয়ামের পরমাণু হালকা হাইড্রোজেন পরমাণুর চাইতে তিনগুণ পরিমাণ ভারী। তারপরও অতি ভারী ট্রিটিয়াম বাতাসের চেয়ে পাঁচগুণ হালকা।

আমরা দেখতে পেলাম যে, হালকা হাইড্রোজেনের অপেক্ষাকৃত ভারী দুটি সমগোত্রীয় প্রকারভেদ রয়েছে- ডিউটেরিয়াম ও ট্রিটিয়াম।

কিন্তু আসলেই কি এগুলো একই রকম? হালকা হাইড্রোজেনের নিউক্লিয়াসে রয়েছে একটি প্রোটন, ডিউটেরিয়ামের আছে একটি প্রোটন ও একটি নিউট্রন এবং ট্রিটিয়ামে একটি প্রোটন এবং দুইটি নিউট্রন। এতদ্‌সত্ত্বেও কেন আমরা ডিউটেরিয়াম এবং ট্রিটিয়ামকে হাইড্রোজেন হিসেবে অভিহিত করে থাকি?

চলো ব্যাপারটি ব্যাখ্যা করা যাক।

হাইড্রোজেন সহজ দাহ্য। দহনের ফলে হাইড্রোজেনের পরমাণু অক্সিজেনের পরমাণুর সঙ্গে যুক্ত হয়ে পানি উৎপন্ন হয়। ডিউটেরিয়াম ও সহজ দাহ্য, অক্সিজেনের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার ফলে এ ক্ষেত্রেও পানি তৈরি হয়। ডিউটেরিয়ামের দহনের ফলে যে পানি উৎপন্ন হয় তা ভারী পানি হিসেবে পরিচিত। কিন্তু এটিকে সাধারণ পানির থেকে আলাদা করে চিহ্নিত করা কঠিন। ট্রিটিয়াম ও অক্সিজেনের বিক্রিয়ার ফলে যে অতি ভারী পানি উৎপন্ন হয় তাও একই রকম। প্রতিটি গ্লাসের পানিতে সামান্য কিছু পরিমাণ হলেও ভারী পানি ও অতি ভারী পানি থাকে।

হাইড্রোজেন
অক্সিজেন
হালকা
হাইড্রোজেন
ডিউটেরিয়াম
ট্রিটিয়াম
H
O
H_2O
পানি

শুধুমাত্র অক্সিজেন নয়, অন্যান্য পদার্থের সঙ্গেও হাইড্রোজেনের তিনটি প্রকারভেদ– হালকা, ভারী ও অতি ভারী একই রকম আচরণ করে।

দেখা যাচ্ছে যে, পরমাণুর নিউক্লিয়াসে নিউট্রন যুক্ত হওয়ার ফলে শুধু ভরই বৃদ্ধি পেয়েছে; কিন্তু এর আচরণে কোন প্রভাব ফেলেনি এবং অন্যান্য পদার্থের পরমাণুর সফঙ্গ আচরণেও কোন পরিবর্তন আসেনি।

সাধারণত যে কোন একটি পদার্থের সকল পরমাণুর গঠন একই রকম এবং অন্য পদার্থের পরমাণুর গঠন থেকে অবশ্যই আলাদা। তবে একই পদার্থের বিভিন্ন গঠনের পরমাণু থাকতে পারে, পার্থক্য শুধু নিউট্রনের সংখ্যায়। কোন একটি পদার্থের ভিন্ন সংখ্যক নিউট্রন সংবলিত পরমাণুগুলোকে পদার্থবিদরা নাম দিয়েছেন 'আইসোটপ'।

পরমাণু কণিকাগুলোর পারস্পরিক বন্ধন

পরমাণুর নিউক্লিয়াসকে কেন্দ্র করে অনবরত আবর্তিত হয় ইলেকট্রন। মনে হয় যেন ইলেকট্রনটি নিউক্লিয়াসের সঙ্গে একটি অদৃশ্য সুতার দ্বারা বেঁধে রাখা হয়েছে। এই অদৃশ্য সুতাটি হচ্ছে ইলেকট্রিক শক্তি। কোথা থেকে এলো এই শক্তি?

প্রিয় বন্ধুরা, চলো একটি গল্প শোনা যাক। আড়াই হাজার বছরেরও পূর্বে প্রাচীন গ্রিসের মিলেট শহরে বাস করতেন বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক ফালেস। একদিন ফালেসের কন্যা চরকায় পশম দিয়ে উল বুনছিলেন। চরকাটি ছিল অ্যাম্বারের তৈরি। হঠাৎ করে তিনি খেয়াল করে দেখলেন যে, পশমগুলো প্রায়শই চরকার গায়ে লেপটে যাচ্ছে। ব্যাপারটি বাবাকে জানানোর পর ফালেস ভাবলেন হয় তো তার কন্য ভুল করছে! নিজেই পরীক্ষা করতে গিয়ে দেখলেন যে, পশম দ্বারা ঘর্ষণের ফলে অ্যাম্বার শুধুমাত্র পশম নয়, সুতা, চুল ও ইত্যাদির বস্তুকেও আকর্ষণ করছে।

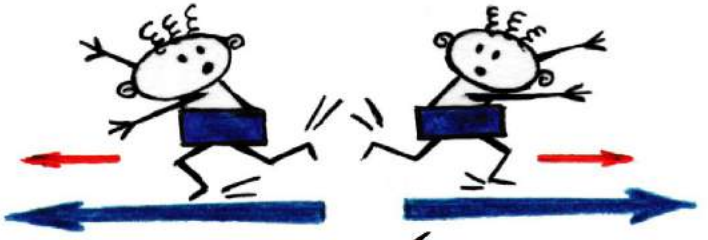

ঋণাত্মক চার্জগুলে
পরস্পরকে বিকর্ষণ করে

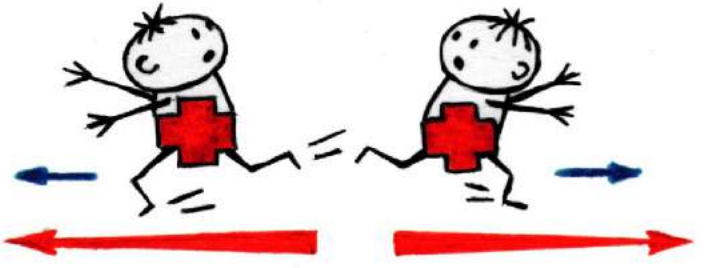

ধনাত্মক চার্জগুলো
পরস্পরকে বিকর্ষণ করে

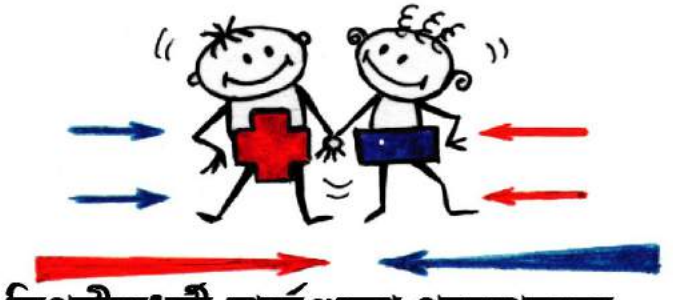

বিপরীতধর্মী চার্জগুলো পরস্পরকে
আকর্ষণ করে

গ্রিক ভাষায় অ্যাম্বার হলো 'ইলেকট্রন'। বহুবছর পরে পশম দ্বারা ঘর্ষণের ফলে অ্যাম্বার হালকা বস্তুকে আকর্ষণ করার যে গুণ অর্জন করে তাকে নাম দেয়া হলো ইলেকট্রিসিটি।

এরই মধ্যে জানা গেল যে, সিল্কের রুমালের সাহায্যে কাচের দণ্ডকে ঘষার পরও এটি বিভিন্ন হলকা বস্তুকে আকর্ষণ করতে শুরু করে। মজার ব্যাপার হলো, যদি অ্যাম্বারের দুটি টুকরোকে পশমের সাহায্যে ঘর্ষণ করা হয় তবে টুকরো দুইটি পরস্পরকে বিকর্ষণ করতে শুরু করে। তেমনিভাবে কাচের দুটি দণ্ডকে যদি সিল্কের রুমালের সাহায্যে ঘর্ষণ করা হয় তবে তারাও পরস্পরকে বিকর্ষণ করে। কিন্তু অন্যদিকে এই অ্যাম্বারের টুকরো ও কাচের দণ্ড পরস্পরকে আকর্ষণ করে।

বিজ্ঞানিরা সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন যে, পশম দ্বারা ঘর্ষিত অ্যাম্বার এবং সিল্কদ্বারা ঘর্ষিত কাচের মধ্যে যে ইলেকট্রিসিটির উদ্ভব হয় তারা ভিন্ন ধর্মের। কাচের বিদ্যুৎকে প্লাস (+) এবং অ্যাম্বারের বিদ্যুৎকে মাইনাস (-) হিসেবে চিহ্নিত করা হলো। অ্যাম্বারে ইলেকট্রিসিটি আগে আবিস্কৃত হলেও এটিকে মাইনাস হিসেবে চিহ্নিত করা হয় তো ঠিক হয়নি, কিন্তু এখন আর কিছুই করার নেই। কিছুই আর পরিবর্তন করা সম্ভব না।

অনেক পরে বিজ্ঞানিরা প্রমাণ করে দেখালেন যে, প্রকৃতিতে ঋণাত্মক চার্জ যুক্ত অতিক্ষুদ্র কণিকা রয়েছে যাকে তারা নাম দিয়েছেন ইলেকট্রন (নিশ্চই মনে আছে যে গ্রিক ভাষায় অ্যাম্বার হচ্ছে ইলেকট্রন)।

এখন বুঝা গেল যে, পশম দ্বারা অ্যাম্বারের ঘর্ষণের ফলে কি ঘটে। অ্যাম্বারে বহুসংখ্যক ইলেকট্রন জড়ো হওয়ার কারণে এটি ঋণাত্মক চার্জ অর্জন করে।

প্রশ্ন হলো, এই ইলেকট্রন কোথা থেকে আসে? পশম থেকে কি? অবশ্যই। সঙ্গে সঙ্গে ইলেকট্রন হারিয়ে পশম ধনাত্মক চার্জ অর্জন করে।

তুমি কি ধনাত্মক চার্জ যুক্ত হতে চাও? এটা খুবই সোজা..... আচড়ে চুল থেকে যথা সম্ভব বেশি ইলেকট্রন ঝেরে ফেল। একটি চিরুনি দিয়ে মাথার চুল কয়েকবার আচড়ে নাও। তবে মনে রেখ, চুলগুলো যাতে শুকনা হয় এবং চিড়নিটি হতে হবে প্লাস্টিকের।

আচড়ে ইলেকট্রন ঝেরে ফেলা ..... শুনতে খুব অদ্ভুত লাগে, তাই না? সত্যিকার অর্থেই চুল থেকে ইলেকট্রন চিরুনীতে স্থান্তরিত হয়েছে। এর ফলে চিরুনীটি ঋণাত্মক এবং চুল ধনাত্মক চার্জ অর্জন করেছে। এখন দেখলে তো ধনাত্মক চার্জযুক্ত হওয়া কত সহজ!

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, ইলেকট্রনের ইলেকট্রিক চার্জের পরিমাণ অতি নগণ্য। পৃথিবীতে এর চাইতে কম চার্জযুক্ত কোন কিছু বিজ্ঞানিরা অদ্যাবধি খুঁজে পাননি।

ইলেকট্রন আবিষ্কারের পর আরো জানা গেল যে, ঋণাত্মক চার্জযুক্ত এই ক্ষুদ্র কণিকাগুলো প্রতিটি পরমাণুতেই রয়েছে। যদি তাই হয়, পরমাণুও ঋণাত্মক চার্জযুক্ত হওয়া উচিত। কিন্তু বাস্তবে ব্যাপারটি মোটেও তা নয়। সাধারণত পরমাণুর কোন ইলেকট্রিক চার্জ প্রকাশ পায় না। উদাহরণ স্বরূপ তুমি জানো যে, হাইড্রোজেনের পরমাণুতে একটি ইলেকট্রন রয়েছে, কিন্তু পরমাণুটি কোন চার্জ বহন করে না। কি কারণ রয়েছে এর পিছনে? পরমাণুতে অবস্থিত ইলেকট্রনের ঋণাত্মক চার্জ কোথায় গেল?

না কোথাও জায়নি। পদার্থবিদরা অনুমান করেছিলেন যে, হাইড্রোজেনের পরমাণুতে ধনাত্মক চার্জযুক্ত অন্যকিছু রয়েছে এবং এর চার্জের পরিমাণ ইলেকট্রনের ঋণাত্মক চার্জের সমান। এর ফলে পরমাণুটি ধনাত্মক বা ঋণাত্মক কোন চার্জই বহন করে না। ধনাত্মক চার্জযুক্ত যে কণিকাটির কথা বলা হচ্ছে– তা হলো প্রোটন।

'ধনাত্মক' চার্জযুক্ত মেষ

এখন কি তোমার কাছে পরিষ্কার, কোন ইলেকট্রিক সুতাটি ইলেকট্রন এবং প্রোটনকে এক সঙ্গে বেঁধে রেখেছে। ঋণাত্মক চার্জযুক্ত কণিকা ধনাত্মক চার্জযুক্ত কণিকাকে নিজের দিকে আকর্ষণ করে। ইলেকট্রন ও প্রোটনের চার্জের পরিমাণও সমান। অতএব, পরমাণুর ভেতরে প্রোটন অদৃশ্য ইলেকট্রিক সুতার সাহায্যে একটি মাত্র ইলেকট্রনকে ধরে রাখতে সক্ষম। পরমাণুতে যদি আরো একটি ইলেকট্রন স্থাপনের চেষ্টা করা হয়– তবে তা ছুটে চলে যাবে।

পরমাণুতে যদি অতিরিক্ত ইলেকট্রন স্থাপন করতে হয় তবে প্রথমেই নিউক্লিয়াসে আরো একটি প্রোটন যোগ করতে হবে। এর পরেই শুধু দ্বিতীয় ইলেকট্রনটি ধরে রাখা সম্ভব হবে।

নিউক্লিয় বল বলতে কি বুঝায়?

কল্পনা কর যে, পরমাণুর কেন্দ্রে বা নিউক্লিয়াসে দুটি করে প্রোটন ও নিউট্রন রয়েছে। এগুলোকে ঘিরে আবর্তিত হচ্ছে দুটি ইলেকট্রন। তুমি কি জানো, এটা কিসের পরমাণু? এই পরমাণুটি হচ্ছে হিলিয়ামের– যা সম্পূর্ণ নতুন একটি গ্যাস, যার সঙ্গে হাইড্রোজেন গ্যাসের কোন মিল নেই, এমন কি অনেক ক্ষেত্রে এদের গুণাগুণ বিপরীতধর্মী হাইড্রোজেনের পরমাণু গুণাগুণের দিক থেকে অনেক সামাজিক; কারণ এটি সহজেই অন্যান্য পরমাণুর সঙ্গে মিলিত হতে পারে, কিন্তু হিলিয়ামের ক্ষেত্রে ব্যাপারটি ভিন্ন। হিলিয়ামের পরমাণু অন্যকোন পদার্থের পরমাণুর সঙ্গে মিলিত হতে অনিচ্ছুক।

কি অদ্ভুতভাবে তৈরি এই পরমাণু জগৎ! হাইড্রোজেনের পরমাণুতে একটি নিউট্রন যোগ করার ফলে পরমাণুটি কিছুটা ভারী হয়ে গেলেও এটি হাইড্রোজেনই থেকে যায়। আরো একটি নিউট্রন যোগ করলে পরমাণুটি আরো ভারী হয়ে যাবে, কিন্তু এর হাইড্রোজেন জাতীয় গুণাগুণে কোন পরিবর্তন আসবে না। কিন্তু একটি প্রোটন যোগ করার সঙ্গে সঙ্গে যেন জাদুদণ্ডের স্পর্শে সম্পূর্ণ ভিন্ন গুণাগুণসম্পন্ন নতুন একটি পরমাণু তৈরি হয়ে গেল। প্রোটনের আকার ও ভর নিউট্রনের মতোই, তবে পার্থক্য এই যে, প্রোটনের চার্জ ধনাত্মক আর নিউট্রনের কোন চার্জ নেই। অর্থাৎ নিউট্রন হচ্ছে চার্জ-নিরপেক্ষ। অতএব, পরমাণুর নিউক্লিয়াসে নিউট্রন যোগ করলে বা বের করে নিলে নিউক্লিয়াসে ইলেকট্রিক চার্জের কোন পরিবর্তন ঘটে না।

পরমাণুর নিউকিয়াসে প্রোটন যোগ করার ফলে এটির ইলেকট্রিক চার্জ দ্বিগুন হয়ে গেছে। অতএব, পরমাণুর গুণাগুণ সর্বপ্রথমে নির্ভর করে নিউক্লিয়াসের চার্জের ওপর।

প্রশ্ন জাগে ধনাত্মক চার্জযুক্ত হওয়া সত্ত্বেও একই নিউক্লিয়াসে কিভাবে একাধিক প্রোটন অবস্থান করে, কেননা, নিশ্চই মনে আছে যে, একই ধরনের চার্জ পরস্পরকে বিকর্ষণ করে। অর্থাৎ নিউক্লিয়াসে প্রোটনগুলো একসঙ্গে থাকার কথা নয় এবং নিউক্লিয়াস অবশ্যই ভেঙ্গে যেতে বাধ্য।

কিন্তু বাস্তবে ব্যাপারটি ভিন, নিউক্লিয়াস ভেঙ্গে যায় না। অধিকন্তু অনেক পরমাণুর নিউক্লিয়াস আশ্চর্যজনকভাবে স্থির ও শক্ত গাঁথুনিতে বাঁধা। নিশ্চই কোন একটি শক্তিশালী কিছু রয়েছে– যা প্রোটনগুলোকে নিউক্লিয়াসে একসঙ্গে থাকতে বাধ্য করে; যদিও এরা পরস্পরকে বিকর্ষণ করে। পদার্থবিদরা এটির নাম দিয়েছেন নিউক্লিয় বল।

এখন চল হিলিয়ামের পরমাণু নিউক্লিয়াসে আরো চারটি করে প্রোটন ও নিউট্রন যুক্ত করি। এখন কি দাঁড়াল? নিউক্লিয়াসে প্রোটন ও নিউট্রনের সংখ্যা দাঁড়ালো ছয়টি করে। তোমার মতে এই নিউক্লিয়াসকে ঘিরে কয়টি ইলেকট্রন আবর্তিত হওয়া উচিত? হ্যাঁ, ছয়টি- নিউক্লিয়াসে যে কয়টি প্রোটন রয়েছে ততোটিই রয়েছে ইলেকট্রন। এখন তুমি পেয়ে গেলে কার্বনের পরমাণু, যে বস্তুটির সঙ্গে তোমার নিয়মিত যোগাযোগ হচ্ছে। উদাহরণস্বরূপ গ্রাফাইটের তৈরি পেন্সিলের শীষ। আর এই গ্রাফাইট তৈরি হচ্ছে কার্বন পরমাণু দিয়ে।

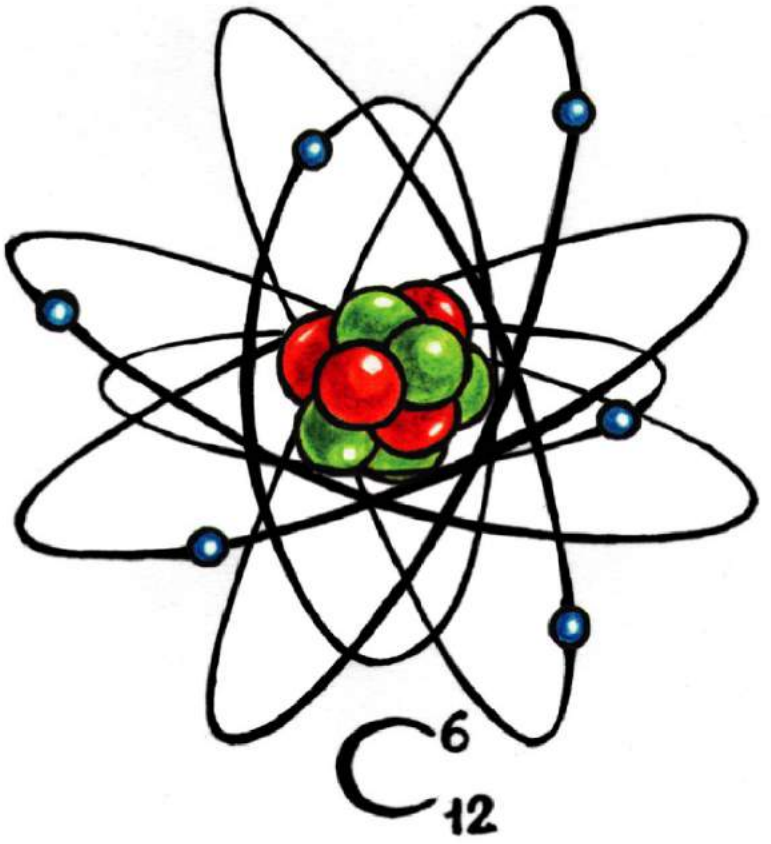

আরো ভারী পরমাণুর নিউক্লিয়াস সংযোজন সম্ভব। যেমন লোহা, যার নিউক্লিয়াসে ২৬টি প্রোটন ও ৩০টি নিউট্রন রয়েছে। সিলভারের ক্ষেত্রে প্রোটনের সংখ্যা ৪৭টি এবং নিউট্রনের সংখ্যা ৬১টি। সোনার নিউক্লিয়াসে রয়েছে ৯৭টি প্রোটন ও ১১৮টি নিউট্রন। ইউরেনিয়ামের পরমাণু নিউক্লিয়াসে এদের সংখ্যা কত?

ইউরেনিয়ামের পরমাণুকে আরো গভীরভাবে পর্যালোচনা করা যায়। যে কোন পরমাণুর মতোই কেন্দ্রে রয়েছে নিউক্লিয়াস, যার চারদিকে একটি সম্মানজনক দূরত্ব রেখে আবর্তিত হচ্ছে হালকা নিউট্রন। নিউক্লিয়াসে ঠাসাঠাসি করে অবস্থান করছে প্রোটন এবং নিউট্রন। ইউরেনিয়ামের অধিকাংশ পরমাণুর নিউক্লিয়াসে রয়েছে ৯২টি প্রোটন ও ১৪৬টি নিউট্রন (মোট ২৩৮টি)। কিন্তু কিছুসংখ্যক নিউক্লিয়াসে প্রোটনের সংখ্যা ৯২টি হলেও নিউট্রনের সংখ্যা তিনটি কম, মাত্র ১৪৩টি (মোট ২৩৫টি)।

তোমার নিশ্চই মনে আছে যে, সকল পরমাণুর নিউক্লিয়াসে প্রোটনের সংখ্যা সমান থাকলেও নিউট্রনের সংখ্যা বিভিন্ন হয়; সেগুলোকে বলা হয় আইসোটপ। পরমাণুর নিউক্লিয়াসে প্রোটন ও নিউট্রনের মোট সংখ্যা 'ভর সংখ্যা' হিসেবে পরিচিত এবং আইসটোপের নামের সঙ্গে এটি যুক্ত থাকে। উদাহরণস্বরূপ ইউরেনিয়াম-২৩৮ ও ইউরেনিয়াম-২৩৫। প্রকৃতিতে ইউরেনিয়াম-২৩৮ এর তুলনায় ইউরেনিয়াম-২৩৫ এর উপস্থিতি অনেক কম।

ইউরেনিয়াম পরমাণু

প্রিয় বন্ধু, আমরা এখন মূল বিষয়ের কাছাকাছি এসে পৌঁছেছি। এর মাধ্যমে আমরা বুঝতে পারব কিভাবে পারমাণবিক শক্তি পাওয়া যায়। তুমি কি জানো, পারমাণবিক চুল্লিতে জ্বালানি হিসেবে কেন শুধুমাত্র ইউরেনিয়াম-২৩৫ ব্যবহার করা সম্ভব? কারণ হলো, এই পরমাণুর একটি বিস্ময়কর গুণ রয়েছে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এই পরমাণুটি আপনা আপনি ভেঙ্গে দুটি টুকরো হয়ে যায়। এর ফলে নিউক্লিয়াস থেকে দুটি বা তিনটি নিউট্রন মুক্ত হয়ে প্রচণ্ড গতিতে ছুটতে থাকে– প্রতি সেকেন্ডে লক্ষ কিলোমিটারেরও বেশি। যখনই এই দ্রুত গতিসম্পন্ন নিউট্রন অন্য একটি ইউরেনিয়াম ২৩৫ নিউক্লিয়াসে এসে আঘাত করে তখনই নিউক্লিয়াসটি ভেঙ্গে দুই টুকরো হয়ে যায়। মুক্ত হয় আরো নিউট্রন। নতুন এই নিউট্রনগুলো অন্য নিউক্লিয়াসে আঘাত করে এবং দুই টুকরো করে দেয়। এভাবে মুক্ত নিউট্রনের সংখ্যা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বাড়তে থাকে ভেঙ্গে যাওয়া নিউক্লিয়াসের সংখ্যাও। এটাই হচ্ছে চেইন রিঅ্যাকশন। এই চেইন রিঅ্যাকশনের ফলে প্রচুর পরিমাণে এনার্জি উৎপন্ন হয় এবং প্রক্রিয়াটি ক্রমান্বয়ে তীব্র থেকে তীব্রতর হতে থাকে। যার ফলে এক সময় বিস্ফোরণও ঘটতে পারে।

নিউট্রন
নিউক্লিয়ার
চেইন
রিঅ্যাকশন
ইউরেনিয়াম
নিউক্লিয়াস
U235
U235
U235

পারমাণবিক জ্বালানির দহন

পারমাণবিক জ্বালানিতে ইউরেনিয়াম-২৩৫ এর পরিমাণ খুব একটা বেশি নয়, মাত্র কয়েক শতাংশ। কারণ চেইন রিঅ্যাকশন যাতে খুব দ্রুত সংঘটিত না হয়, কোন দুর্ঘটনা পরিস্থিতির উদ্ভব না ঘটে এবং আমরা আমাদের প্রয়োজন মতো চেইন রিঅ্যাকশন নিয়ন্ত্রণ করতে পারি।

প্রিয় বন্ধু, তোমার কি মনে হয় কোন ধরনের নিউট্রন দ্রুত না মন্থর ইউরেনিয়াম-২৩৫ নিউক্লিয়াসকে ভাঙ্গতে বেশি কার্যকরী? তুমি হয় তো ভাবছো দ্রুত নিউট্রনের কথা। কিন্তু বাস্তবে মন্থর নিউট্রনগুলো বেশি কার্যকরী। ক্ষুদ্র পরমাণুর জগতে কত অদ্ভুত জিনিসই না আমরা দেখতে পাচ্ছি!

যদি মন্থর নিউট্রনগুলো ইউরেনিয়াম-২৩৫ নিউক্লিয়াস ভাঙ্গার ক্ষেত্রে বেশি কার্যকরী হয়ে থাকে এর অর্থ হচ্ছে দ্রুত নিউট্রনগুলোকে মন্থর গতির নিউট্রনে রূপান্তর করা! এ লক্ষ্যেই ব্যবহৃত হয় গ্রাফাইট অথবা পানি। এগুলোর প্রভাবে নিউট্রনের গতি অনেকগুণে কমে আসে। যেমনটি আমরা দেখি মানুষের ক্ষেত্রে

গতির মন্থরকরণ!

যখন সে বুক পানিতে দৌড়ানোর চেষ্টা করে। যে সকল পারমাণবিক চুল্লিতে এই মন্থরকারী পদার্থ ব্যবহৃত হয় সেগুলো মন্থর নিউট্রনভিত্তিক চুল্লি হিসেবে পরিচিত।

তোমার জেনে রাখা ভালো, এমন চুল্লিও রয়েছে যেগুলোতে ব্যবহৃত হচ্ছে দ্রুত গতির নিউট্রন। রাশিয়ার উড়াল অঞ্চলে শিল্প হিসেবে এখনও সফলভাবে কাজ করে যাচ্ছে বিশ্বের একমাত্র 'ফাস্ট' বা দ্রুত চুল্লি। কিন্তু পদার্থবিদরা মন্থর নিউট্রনভিত্তিক চুল্লি দিয়ে কাজ শুরু করেছিল। বিশ্বের প্রথম পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রটি ছিল মন্থর নিউট্রনভিত্তিক। ১৯৫৪ সালে রাশিয়ার মস্কো শহরের অদূরে অবনিনস্কে এই বিদ্যুৎ কেন্দ্রটির উদ্বোধন করা হয়।

নিউট্রনের সাহায্যে পরমাণুর নিউক্লিয়াসতো ভাঙ্গা হলো ..... তার পর কী? ইউরেনিয়াম-২৩৫ এর ভাঙ্গা টুকরোগুলো বাস্তবে নতুন দুটি পদার্থ। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এই টুকরোগুলো হচ্ছে স্ট্রোনসিয়াম ধাতু এবং ভারি গ্যাস জেননের নিউক্লিয়াস। কি আশ্চর্য ব্যাপার তাই না? একটি পদার্থ ভেঙ্গে এমন দুটি পদার্থ তৈরি হলো যেগুলোর সঙ্গে প্রাথমিক পদার্থটির কোন মিলই নেই!

নিউক্লিয়াসের টুকরোগুলো নিউট্রনের মতোই দ্রুত গতিতে ছুটতে থাকে। কিন্তু নিউট্রনের মতো তারা অন্য পরমাণুকে আঘাত করে তার নিউক্লিয়াসকে ভেঙ্গে ফেলে না। টুকরোগুলোর আঘাতে পরমাণুগুলোতে কম্পনের সৃষ্টি হয়। এই কম্পন ক্রমান্বয়ে দ্রুত হতে থাকে এবং যে জ্বালানি রডে এই পরমাণুগুলো অবস্থান করে তার তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেতে থাকে। জ্বালানি রডটি এতোটাই উত্তপ্ত হয়ে উঠে– যদি এর সংস্পর্শে পানিসহ কোন পাত্র রাখা যায় তবে

সেই পানি নিমিষেই বাষ্পীভূত হয়ে যাবে। বিদ্যুৎ শক্তি পাওয়ার জন্য আমাদের এই বাষ্পেরই দরকার ছিল। এই বাষ্প টারবাইনকে ঘুরাতে সাহায্য করে। অন্যদিকে টারবাইন বিদ্যুৎ জেনারেটরকে সচল করে এবং বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়। বিদ্যুৎ মোটরের সাহায্যে জাহাজের প্রপেলার ঘুরায়। পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র থেকে যে বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয় তা ইলেকট্রিক তারের সাহায্যে বিভিন্ন শিল্প কারখানায় সরবরাহ করা হয়ে থাকে। এর সাহায্যেই বাসগৃহ, রাস্তা, স্কুলসহ বিভিন্ন স্থানে আলো পাওয়া যায়। বিদ্যুতের ব্যবহার অনেক বিস্তৃত, বিদ্যুৎ আমাদের জীবনে বিভিন্ন কাজে ব্যবহৃত হয় এবং জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন করতে যেমন সহায়তা করে অনেক স্বাচ্ছন্দ্যও বয়ে আনে সকলের জন্য।

অতিরিক্ত নিউট্রন কিভাবে আটকানো যায়

আমরা শিগগিরই একটি পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রে পৌঁছব এবং মনোযোগের সঙ্গে এর কার্যক্রম দেখব ও বুঝার চেষ্টা করব। আমরা যে বিদ্যুৎকেন্দ্রটি পরিদর্শন করব তা সমুদ্রের তীরে অবস্থিত। কিন্তু এই মুহূর্তে দেখব আমাদের চুল্লির কি অবস্থা, কি ঘটছে সেই কম্পনশীল ইউরেনিয়াম পরমাণুর সঙ্গে, যেগুলো পানিকে উত্তপ্ত করছিল।

একটি ব্যাপারে তোমাকে সাবধান করে দিতে চাই। তোমার কি মনে আছে? আমি বলে ছিলাম যে ইউরেনিয়াম-২৩৫ পরমাণুর নিউক্লিয়াসে যখন একটি নিউট্রন আঘাত করে ভেঙ্গে দেয় তখন দুই/তিনটি নিউট্রন ছুটে বেরিয়ে আসে। এই তিনটি নিউট্রন আরও তিনটি পারমাণুকে ভেঙ্গে দেয়। ধরা যাক, প্রতিটি

ভেঙ্গে যাওয়া নিউক্লিয়াস থেকে আবারো তিনটি করে নিউট্রন বেড়িয়ে আসছে। ফলে আমরা পাচ্ছি ৯টি নতুন নিউট্রন ..... এ ভাবেই প্রক্রিয়াটি চলতে থাকবে। ভেঙ্গে যাওয়া নিউক্লিয়াস থেকে ছুটে বেড়িয়ে যাওয়া নিউট্রনের সংখ্যা এবং উৎপন্ন শক্তির পরিমাণ দ্রুত বাড়তে থাকবে। যদি ব্যাপারটি এমনিভাবেই চলতে থাকে তবে চুল্লিটি নিজেই অত্যন্ত গরম হয়ে গলে যেতে পারে! ইউরেনিয়াম-২৩৫ এর সঙ্গে মজা করার কোন সুযোগ নেই। একে সব সময় চোখে চোখে রাখা দরকার।

এ জাতীয় বিপদ থেকে কিভাবে রক্ষা পাওয়া যেতে পারে? খুব সোজা : পারমাণবিক বিক্রিয়াটিকে নিয়ন্ত্রণের মধ্যে রাখতে হবে।

পরমাণুর বিস্ময়কর জগতে এমন বিশেষজ্ঞ আছেন– যারা পারমাণবিক চুল্লিতে শৃঙ্খলা রক্ষা করেন। তারা নিউট্রনকে ইচ্ছামতো ছোটাছুটি করতে দেন না এবং ততসংখ্যক নিউট্রনকেই মুক্ত অবস্থায় থাকতে দেন যতগুলো প্রয়োজন– কম বা বেশি নয়! বোরন নামে একটি পদার্থ আছে, যার পরমাণু চেইন রিঅ্যাকশন নিয়ন্ত্রণে সহায়তা করে। কিন্তু মনে রেখ বোরনের সব পরমাণুই এটি করতে সক্ষম নয়। দুটি আইসোটোপ বোরন-১০ এবং বোরন-১১কে এ কাজে ব্যবহার করা হয়।

বোরন-১০ এর পাশ দিয়ে যখনই কোন নিউট্রন অতিক্রম করে তখনই সেটিকে আটকে দেয় এবং নিউট্রনটিকে নিজের নিউক্লিয়াসের সঙ্গে যুক্ত করে নেয়। কিন্তু বোরন-১১ নিউট্রনকে না আটকিয়ে বরং দূরে ঠেলে দেয়। ফলে কি দেখা যাচ্ছে? বোরন-১০ই শুধুমাত্র অতিরিক্ত নিউট্রন থেকে মুক্তি পেতে সহায়তা করতে পারে।

বোরন-১০ এর পরমাণু ছাড়াও অন্য কয়েকটি পদার্থ রয়েছে– যাদের পরমাণু নিউট্রনকে আটকে দিতে সক্ষম, যেমন ক্যাডমিয়াম ধাতু। পারমাণুবিক চুল্লিতে বোরন-১০ এবং ক্যাডমিয়ামের পরমাণু যোগ করলে তারা প্রায় সকল মুক্ত নিউট্রনকে শুষে নেয়। এর ফলে চুল্লির কার্যক্রম মন্থর হয়ে যায়– যেমনটি ঘটে চুলায় পানি ঢালার পরে।

যে পদার্থগুলোর কথা উল্লেখ করলাম এগুলো দিয়ে নিয়ন্ত্রণকারী রড তৈরি করার পর চুল্লিতে স্থাপন করা হয়। নিয়ন্ত্রণকারী রডগুলো যখন সম্পূর্ণভাবে চুল্লির ভেতর অবস্থান করে তখন কোন চেইন রিঅ্যাকশন ঘটতে পারে না।

কি ঘটবে, যদি এই নিয়ন্ত্রণকারী রডগুলোকে কিছুটা বের করে আনা হয়?

নিউট্রন শোষণের পরিমাণ কমে যাবে, কিছুসংখ্যক নিউট্রন মুক্ত হয়ে চেইন রিঅ্যাকশনের সূচনা করবে এবং ইউরেনিয়াম উত্তপ্ত হতে থাকবে। যদি রডগুলোকে আরও বেশি বের করে আনা হয় তখন মুক্ত নিউট্রনের সংখ্যা আরো বৃদ্ধি পাবে এবং ইউরেনিয়াম-২৩৫ পরমাণু বিভাজন প্রক্রিয়া আরও গতি লাভ করবে। এর ফলে ইউরেনিয়াম-২৩৫ আরও বেশি উত্তপ্ত হয়ে উঠবে। রডগুলোকে যদি আবার ঢুকিয়ে দেয়া হয় তবে মুক্ত নিউট্রনের সংখ্যা কমে আসবে এবং সঙ্গে সঙ্গে ইউরেনিয়াম-২৩৫ এর বিভাজন প্রক্রিয়াও মন্থর হয়ে যাবে।

ইউরেনিয়াম-২৩৫ পরমাণু বিভাজনকারী মুক্ত নিউট্রন অনেক বিপজ্জনক; কারণ এগুলো আমাদের শরীর যে সকল পরমাণু দিয়ে গঠিত সেগুলোকেও ভেঙ্গে দিতে পারে। এই মুক্ত নিউট্রন থেকে আমরা কিভাবে রক্ষা পেতে পারি? এটা সম্ভব– যদি আমরা বিশেষ পরমাণু দিয়ে তৈরি ঢাল ব্যবহার করি। এই পরমাণুগুলো নিউট্রনকে বিকর্ষণ করে দূরে ঠেলে দেয়।

বোরন-১১ পরমাণুর কথা মনে আছে তো?

ইস্পাতে বোরন-১১ পরমাণু যুক্ত করে আমরা চুল্লির জন্য প্রতিরক্ষা দেয়াল তৈরি করতে পারি। এর ফলে একটি নিউট্রনও দেয়াল ভেদ করে বাইরে আসতে পারবে না, কারণ দেয়ালের কাছাকাছি আসার সঙ্গে সঙ্গে বোরন-১১ পরমাণু এগুলোকে বিকর্ষণ করবে।

তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ থেকে বিকিরণ

আইসোটোপ শব্দটির সঙ্গে তোমরা ইতোমধ্যেই পরিচিত। এটা হচ্ছে সেই পদার্থ– যার পরমাণুগুলোর নিউক্লিয়াসে একই সংখ্যক প্রোটন থাকলেও নিউট্রনের সংখ্যা ভিন্ন। কিছুসংখ্যক আইসোটোপ সম্বন্ধে তুমি জানতে পেরেছ, যেমন ইউরেনিয়ামের আইসোটোপ ইউরেনিয়াম-২৩৫ এবং বোরনের আইসোটোপ বোরন-১০ এবং বোরন-১১। অধিকাংশ রাসায়নিক মৌলিক পদার্থেরই আইসোটোপ রয়েছে এবং এর মধ্যে কিছুসংখ্যক আবার তেজস্ক্রিয়।

তেজস্ক্রিয়তা বা রেডিওএক্টিভ বলতে কি বুঝায়? 'রেডিও' একটি ল্যাটিন শব্দ যার অর্থ হচ্ছে বিকিরণ। রেডিওএক্টিভ আইসোটোপ (রেডিও আইসোটোপ) হচ্ছে সেই আইসোটোপগুলো– যারা কিছু না কিছু বিকিরণ করে।

ইলেক্ট্রিক বাল্ব আলো বিকিরণ করে, রেডিয়েটর থেকে বিকিরিত হয় তাপ। রেডিও স্টেশন থেকে বিকিরিত হয় রেডিও ওয়েভ। প্রশ্ন হলো রেডিওএক্টিভ আইসোটোপ কি বিকিরণ করে?

তুমি ইতোমধ্যে জেনে গেছ, বোরন-১০ ও বোরন-১১ আইসোটোপ রেডিওএক্টিভ নয়। কিন্তু বোরোন-১১ পরমাণু নিউক্লিয়াসে যদি একটি নিউট্রন যোগ করা হয় তাহলে কি হবে? বোরন-১১ তখন বোরন-১২ তে রূপান্তরিত হবে। হতে পারে নতুন এই আইসোটোপটি রেডিওএকটিভ!

কিন্তু বোরন-১১ পরমাণুর নিউক্লিয়াসে আর একটি নিউট্রন যোগ করা সম্ভব নয়, কারণ, নিউক্লিয়াসটি তৎক্ষণাৎ ভেঙ্গে পড়বে এবং এটি থেকে প্রতি সেকেন্ডে ২০ হাজার কিলোমিটার বেগে বেরিয়ে আসবে দুইটি প্রোটন ও দুইটি নিউট্রন। এই কণিকাগুলো কিন্তু আলাদা হয়ে বেরিয়ে আসবে না বরং একই সঙ্গে মিলে ছুটে বেরিয়ে আসবে।

দুইটি প্রোটন এবং দুইটি নিউট্রন যখন এক সঙ্গে শক্তভাবে লেগে থাকে পদার্থবিদরা একে বলেন, আলফা কণিকা। আলফা কণিকার প্রবাহকে বলা হয় আলফা রেডিয়েশন বা আলফা বিকিরণ।

আলফা কণিকা বেরিয়ে আসার পর অবশিষ্ট নিউক্লিয়াসে কিছু অদ্ভুত ব্যাপার ঘটতে থাকে। চল, দেখা যাক কি হচ্ছে ওখানে।

বোরন-১২ পরমাণু নিউক্লিয়াসে রয়েছে ৫টি প্রোটন ও ৭টি নিউট্রন। দুইটি প্রোটন এবং দুইটি নিউট্রন আলফা কণিকা হয়ে বের হয়ে এলো। এখন কয়টি প্রোটন এবং কয়টি নিউট্রন থেকে গেল?

হিসাবটা খুব সোজা– তিনটি প্রোটন এবং পাঁচটি নিউট্রন! কিন্তু বাস্তবে ব্যাপারটি এমন নয়। তিনটির জায়গায় আমরা দেখতে পাচ্ছি, এখন রয়েছে চারটি প্রোটন এবং পাঁচটি নিউট্রনের পরিবর্তে মাত্র চারটি! কোথা থেকে এলো এই অতিরিক্ত প্রোটন এবং কোথায় হারিয়ে গেল একটি নিউট্রন? আসলে যা ঘটেছে তা হলো একটি নিউট্রন প্রোটনে রূপান্তরিত হয়েছে। মজার ব্যাপার হলো এই রূপান্তরের সময় অতিরিক্ত একটি ইলেকট্রনের উদ্ভব ঘটেছে।

নতুন এই ইলেক্ট্রনিটির অবস্থান কোথায়? এটির কোন অস্তিত্ব পরমাণুতে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না; কারণ এটি অবিশ্বাস্য প্রায় আলোর গতিতে ছুটে বেরিয়ে এসেছে। আলোর গতি কত জানো কি? প্রতি সেকেন্ডে ৩ লক্ষ কিলোমিটার!

রেডিওএক্টিভ আইসোটোপের নিউক্লিয়াস থেকে যে ইলেকট্রন উৎপন্ন হয় পদার্থবিদরা তাকে নাম দিয়েছেন বিটা কণিকা। আর বিটা কণিকার প্রবাহকে বলা হয় বিটা রেডিয়েশন। এখন কি দাঁড়ালো? বোরন-১২ আলফা ছাড়াও বিটা কণিকা বিকিরণ করে। কিন্তু এখানেই শেষ নয়!

বোরন-১২ পরমাণুর নিউক্লিয়াস যখন ভেঙ্গে গেল তা থেকে আরো বিকিরিত হয়েছে গামা রশ্মি। বিভিন্ন গুণাগুণের বিচারে গামা রশ্মির সফঙ্গ এক্স-রে রশ্মির অনেক মিল রয়েছে। তোমরা জান যে, এক্স-রে রশ্মি চিকিৎসার ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। গামা রশ্মির একটি গুণ হলো যে, এক্স-রের চাইতে এটি সহজে কোন বাধা ভেদ করে যেতে পারে।

পরমাণুর নিউক্লিয়াসে সৃষ্ট ইলেকট্রন

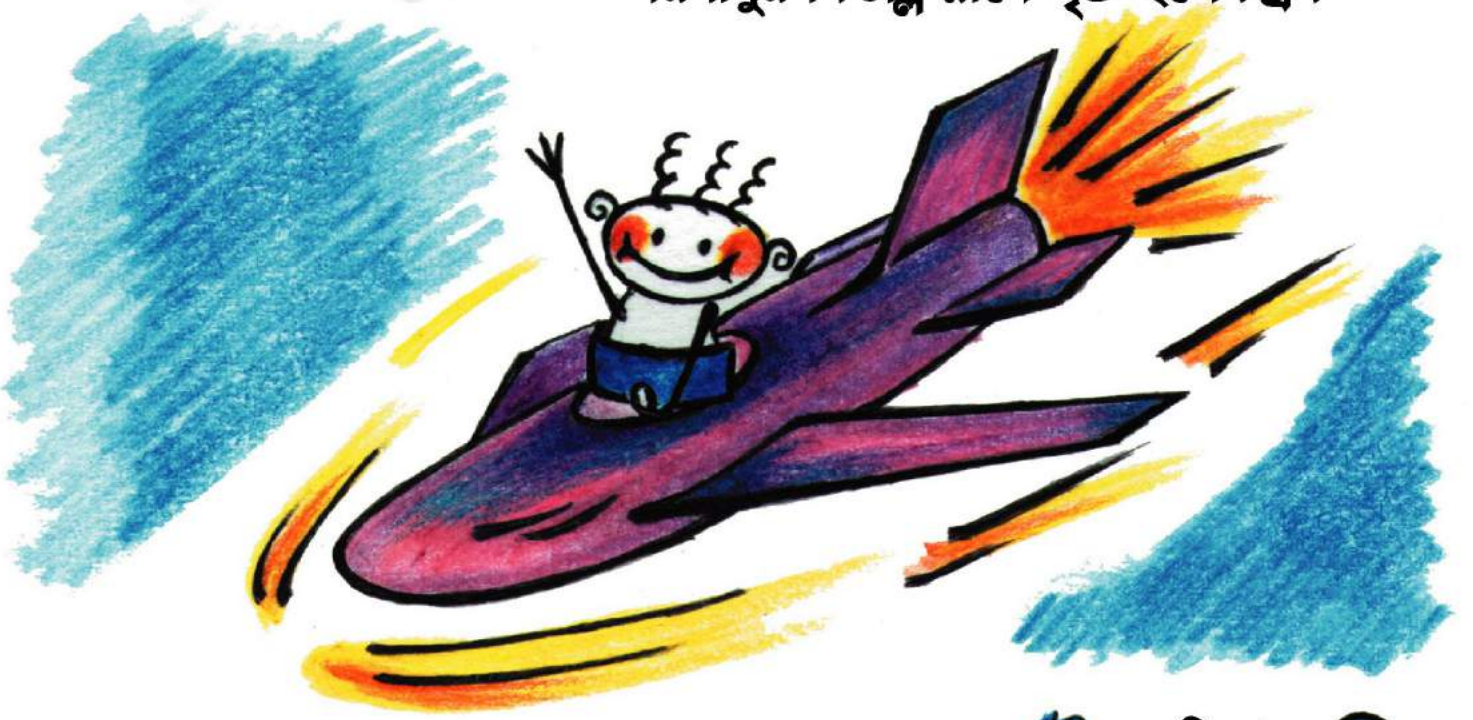

আমরা তিন ধরনের রেডিয়েশন সম্পর্কে জানতে পারলাম : আলফা, বিটা, ও গামা। বোরন-১২ থেকে এই তিন ধরনের রেডিয়েশনই পাওয়া যায়। কিন্তু সকল তেজস্ক্রিয় আইসোটোপই এমন নয় : কোনটি হয়তো আলফা রশ্মি কোনটি বা বিটা রশ্মি বিকিরণ করে থাকে।

কোন রেডিও আইসোটোপের পরমাণু নিউক্লিয়াসগুলো এক সঙ্গে ভেঙ্গে যায় না, অল্প কিছুসংখ্যক করে আস্তে আস্তে ভাঙ্গতে থাকে। এমন একটি সময় আসে যখন ভাঙ্গার মতো এত অল্পসংখ্যক নিউক্লিয়াস অবশিষ্ট থাকে যে, রেডিও আইসোটোপটির অস্তিত্ব আর টের পাওয়া যায় না। কত দ্রুত এই ব্যাপারটি ঘটতে পারে? বোরন-১২ এর বেলায় সময়টি খুবই কম : এক সেকেন্ডের এক শত ভাগের দুই ভাগ সময়েরও কম লাগে এটি অর্ধেক পরমাণু ভেঙ্গে যেতে। পরবর্তী একই সময়ের মধ্যে অবশিষ্টাংশের অর্ধেক ভেঙ্গে যায় এবং এভাবেই চলতে থাকে। বলতে গেলে চোখের পলকে বোরন-১২ এর অস্তিত্ব প্রায় বিলুপ্ত হয়ে যায়।

কিন্তু সব রেডিওআইসোটোপের বেলায় ব্যাপারটি এমন নয়। অনেক রেডিও আইসোটোপের জীবনকাল যথেষ্ট দীর্ঘ। উদাহরণস্বরূপ ভারী ধাতু থোরিয়াম-২৩২ এর অর্ধেক পরমাণুর নিউক্লিয়াস ভেঙ্গে যেতে সময় লাগে এক হাজার চারশত কোটি বছর!

রেডিও একটি আইসোটোপের অর্ধেক সংখ্যক পরমাণু নিউক্লিয়াস ভেঙ্গে যেতে যে সময় প্রয়োজন হয় পদার্থবিদদের ভাষায় একে বলা হয় 'হাফ লাইফ'।

লোহার ৬টি রেডিও একটি আইসোটোপ রয়েছে– যেগুলোর হাফ লাইফ বিভিন্ন: আট ঘণ্টা, ৯ মিনিট, আড়াই বছর, দেড় মাস, তিন লাখ বছর, সাড়ে পাঁচ মিনিট। এখন পর্যন্ত এক হাজারেরও বেশি আইসোটোপের সন্ধ্যান আমরা পেয়েছি। এর মধ্যে কিছুসংখ্যক রয়েছে প্রকৃতিতে এবং অধিকাংশ পাওয়া গেছে কৃত্রিমভাবে, হয় রিঅ্যাক্টরে বা ল্যাবরেটরিতে।

তোমার হয়তো জানতে ইচ্ছে করছে এতদ্‌সংক্রান্ত জ্ঞান আমাদের কি উপকারে আসে কিংবা বিজ্ঞানিরা কেনই বা প্রকৃতিতে এ সকল রেডিও আইসোটোপ খুঁজে বেড়াচ্ছেন অথবা কৃত্রিমভাবে উৎপাদন করছেন। একটি উদাহরণ দিয়ে ব্যাখ্যা করা যাক।

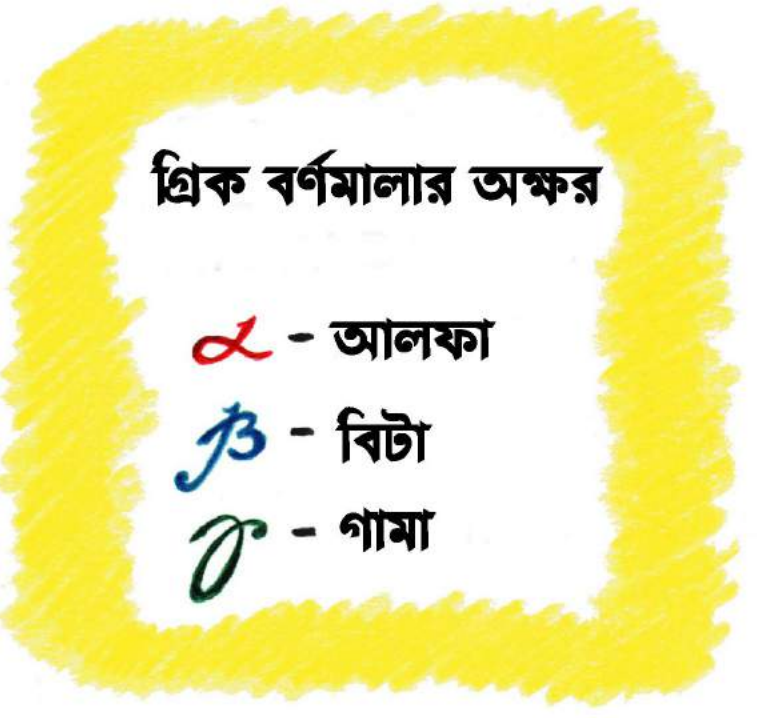

আমরা কার্বনের বিষয়ে আলোচনা করেছি। পদার্থটির সঙ্গে প্রায়শই আমাদের সাক্ষাৎ ঘটে। প্রকৃতি থেকে আমরা কার্বনের একটি আইসোটোপ-কার্বন-১৪ পেয়ে থাকি। কার্বন-১২ পরমাণুর নিউক্লিয়াসে ৬টি করে প্রোটন ও নিউট্রন থাকে। এর সঙ্গে যদি আরো দুইটি নিউট্রন যুক্ত হয় তবেই আমরা পাব কার্বন-১৪। প্রতিটি গাছপালা, জীবজন্তু ও মানবদেহে রেডিওএক্টিভ কার্বনের উপস্থিতি রয়েছে। প্রত্নতত্ত্ববিদদের জন্য এটি একটি অতি উপকারী তথ্য। ধরে নেই, তারা কাঠের বনফায়ার থেকে কয়লা সংগ্রহ করে গবেষণা করছেন। কার্বনের কয়টি পরমাণু নিউক্লিয়াস অক্ষত আছে এবং কয়টি ভেঙ্গে গেছে এ তথ্যটি জানার পর তারা অত্যন্ত সঠিকভাবে বলে দিতে পারবেন কখন এই বনফায়ারটি করা হয়েছিল। কিংবা আমাদের পূর্ব পুরুষরা কত বছর পূর্বে এটি ব্যবহার করেছিলেন।

কি বিস্ময়কর ব্যাপার তাই না!

বায়ুমণ্ডলে জমতে থাকা গ্রিনহাউস গ্যাস

ভ্রমণ এগিয়ে চলছে

আ এতক্ষণ আমরা সমুদ্রগামী পরমাণু শক্তিচালিত জাহাজে কাল্পনিকভাবে ভ্রমণ করছিলাম। আমরা অনেক মজার ব্যাপার জানতে পেরেছি যেমন– পরমাণুর গঠন এবং কার্যক্রম। চলো এবার আমরা আমাদের পদ্মা নদী ভ্রমণে ফিরে আসি। আমাদের ডানে ও বামে অনিন্দ সুন্দর প্রকৃতি, শস্যক্ষেত, সবুজ বনরাজি। নদীতে বিভিন্ন রংয়ের পালতুলে বয়ে চলেছে নৌকাগুলো, জেলেরা জাল ফেলে মাছ ধরছেন। দারুণ এক পরিবেশ আমাদের ঘিরে রেখেছে। কিন্তু এ কি? সূর্যটাকে ঢেকে রেখেছে বৃহদাকারের ঘনকাল মেঘ। কিন্তু এটাতো মেঘ মনে হচ্ছে না। তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের সুউচ্চ চিমনি থেকে নির্গত ধোঁয়া– যা প্রকৃতি দূষণ করছে।

তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রে শক্তি উৎপাদনের জন্য বিভিন্ন ধরনের জ্বালানি ব্যবহৃত হয়। এই জ্বালানিগুলো ভূগর্ভ থেকে উত্তোলন করা হয়ে থাকে যেমন– কয়লা, তেল, গ্যাস। প্রকৃতিতে এ সব জ্বালানি মজুদ অনেক হলেও সীমাহীন নয় এবং এগুলোর ব্যাপক ব্যবহারের ফলে এক সময় শেষ হতে বাধ্য।

তবে এনার্জি পাওয়ার অন্য উপায়ও রয়েছে।

যেমন সূর্য, যা কি না এনার্জির একটি বিশাল উৎস। সূর্য আমাদের আলো ও তাপ দিয়ে থাকে। সূর্য থেকে প্রাপ্ত এনার্জি এক দিকে যেমন বিপজ্জনক নয় অন্য দিকে এর নিঃশেষ হওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো যে এই এনার্জি প্রকৃতিবান্ধব অর্থাৎ এর দ্বারা প্রকৃতি বা মানুষের কোন ক্ষতি হয় না। সূর্যালোক থেকে এনার্জি পাওয়ার জন্য যে সকল যন্ত্র বা সরঞ্জাম এখন পর্যন্ত আবিস্কৃত হয়েছে সেগুলো খুব একটা সস্তা বা ব্যবহারের জন্য সুবিধাজনক নয়। তবে কে জানে হয়তো যখন বড় হবে তুমি নিজেই ভালো কিছু আবিষ্কার করতে সক্ষম হবে!

আরো একটি শক্তির উৎস রয়েছে সেটি হচ্ছে বাতাস। এই উৎসটিও প্রকৃতি দূষণ করে না। বিশাল আকার প্রপেলার ব্যবহার করে আমরা বাতাস থেকে বিদ্যুৎ শক্তি পেতে পারি। কিন্তু পদ্মা নদীর তীর ঘেঁষে এমন কোন বায়ুকল এখনো আমাদের চোখে পড়েনি। বায়ু শক্তি ব্যবহারের ক্ষেত্রে মূল অন্তরায় হলো যে, বায়ূকলগুলো নিয়মিতভাবে একই হারে বিদ্যুৎ উৎপাদন করতে সক্ষম নয়। কারণটা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ। বায়ু প্রবাহ এবং এর গতি বেগ আমাদের ইচ্ছার ওপর নির্ভর করে না। তবে কিছু অঞ্চল রয়েছে যেখানে মোটামুটি নিয়মিত বায়ু প্রবাহ পরিলক্ষিত হয়, সেখানে এ জাতীয় বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপন যুক্তিযুক্ত।

পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র পরিদর্শন

এখন চলো আমরা একটি রুশ পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র পরিদর্শন করি। যে কোন পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রে ঢুকতে গেলে প্রত্যেককে মাথায় হেলমেট পরে নিতে হয় এবং পরিদর্শনকারী প্রয়োজনীয় ব্যক্তিগত ডকুমেন্ট পরীক্ষা করা হয়। আমরা একটি চালু এনার্জি ব্লক দেখব। কি দেখতে পাচ্ছি আমরা? বিশাল অট্রালিকার কমপ্লেক্স, বিশাল আকার বিদ্যুৎ ট্রান্সফরমার, পাম্প স্টেশন, শীতলীকরণ জলাধার যাতে রয়েছে অসংখ্য ফোয়ারা, বিভিন্ন গ্যাস ভর্তি বড় বড় সিলিন্ডার, বিভিন্ন ধরনের পাইপের নেটওয়ার্ক ইত্যাদি! দেখে নিশ্চই তাক লেগে যাচ্ছ। প্রথমেই যে জিনিসটি চোখে পড়ে তা হলো এনার্জি ব্লকটির পরিচ্ছন্নতা, সবকিছু যেন ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করে নতুন করে রং করা হয়েছে। বিল্ডিংগুলোর মাঝে মাঝে রয়েছে বিভিন্ন ফুলের বাগান, রাস্তাগুলো যেন নতুন করে কার্পেটিং করা হয়েছে। সবকিছু এত সাজানো-গুছানো যে, মনটা আনন্দে ভরে ওঠে। বাতাসটাও অনেক পরিষ্কার, শ্বাস নেয়ার সময় তা অনুভব করা যাচ্ছে। চোখে পড়ছে রেললাইন, যা দিয়ে চলছে রেলের ওয়াগন। ওয়াগনের প্লাটফর্মে পারমাণবিক জ্বালানি বোঝাই কনটেইনার। পারমাণবিক চুল্লিতে একবার জ্বালানি ভরলে তিন বছর চলে যায়। এরপর এগুলোকে বিশেষ জলাধারে সংরক্ষণ করা হয় এবং পরবর্তীতে পুনঃপ্রক্রিয়াজাত করার জন্য বিশেষ কারখানায় পাঠানো হয়ে থাকে।

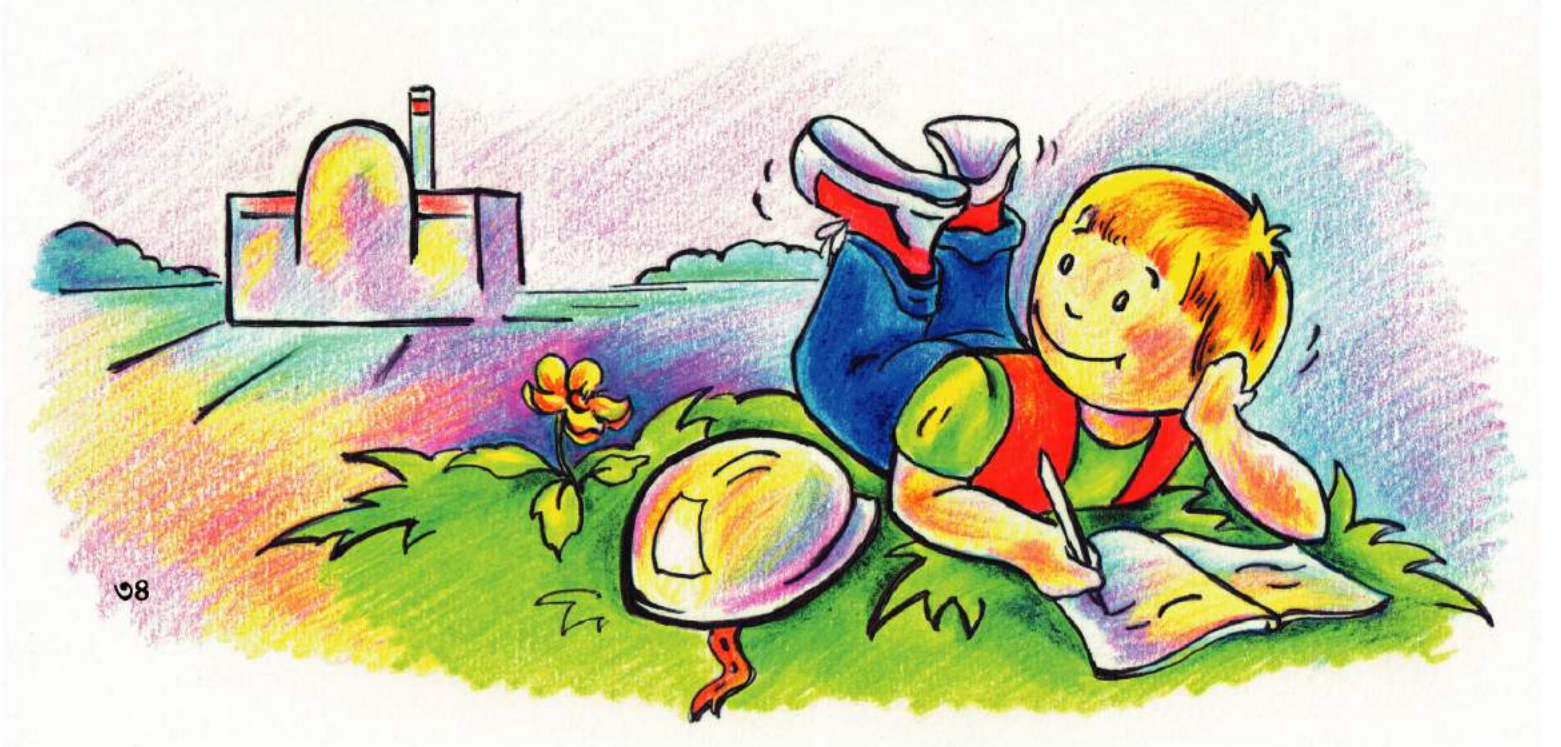

পারমাণবিক জ্বালানির পুনঃপ্রক্রিয়াজাতকরণ খুব একটা সহজ কাজ নয়, এ জন্য বিভিন্ন আধুনিক জটিল যন্ত্রপাতির ব্যবহার করতে হয় ও বিভিন্ন প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে যেতে হয়।

পারমাণবিক এনার্জি ব্লক একটি বিশাল স্থাপনা। তুমি হয়তো এ জাতীয় কিছু পূর্বে দেখার সুযোগ পাওনি। রিঅ্যাক্টর স্থাপনাটির উচ্চতা ৬৭ মিটার। পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের মূল অংশ হচ্ছে এনার্জি ব্লক; এখানে স্থাপন করা হয় পারমাণবিক চুল্লি বা রিঅ্যাক্টর, যেটি পানিকে গরম করে, বাষ্প টার্বাইন এবং বিদ্যুৎ জেনারেটর।

পারমাণবিক রিঅ্যাক্টর এবং এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য যন্ত্রপাতি একটি দৃঢ়, নিশ্চিদ্র আরসিসি খাঁচার মধ্যে আবদ্ধ থাকে। এটিকে এমনভাবে তৈরি করা হয় যাতে ভূমিকম্প, হ্যারিকেন, টর্নেডো, ধূলিঝড়, এয়ারওয়েভের ধাক্কাসহ বিভিন্ন প্রতিকূলতায় এটি ক্ষতিগ্রস্ত হয় না। এমন কি একটি বড় উড়োজাহাজও উপরে এসে পড়লেও এটি ক্ষতিগ্রস্ত হবে না।

তোমার পরমাণু শক্তি চালিত জাহাজটির মতোই পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের হার্ট হচ্ছে রিঅ্যাক্টর। এর মূল কাজ হলো অনবরতভাবে বিশাল পরিমাণে তাপ উৎপাদন করা। তুমি কি সেই পানির কথা কল্পনা করতে পার? যার তাপমাত্রা ১০০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডের বেশি (আমরা জানি যে, ১০০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় পানি ফুটে বাষ্পে পরিণত হয়)। হ্যা এটা সম্ভব, যদি পানিকে উচ্চ চাপের মধ্যে রাখা হয়। রিঅ্যাক্টর থেকে যে পানি বের হয়ে আসে তার তাপমাত্রা ৩২০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড! এই পানি বাষ্প জেনারেটরে গিয়ে তার তাপমাত্রা অন্য পানিতে স্থানান্তর করে এবং দ্বিতীয় পানিটি বাষ্পে রূপান্তরিত হয়। এই বাষ্প প্রচণ্ড চাপের সাহায্যে বাষ্প টার্বাইনে পাঠানো হয়। বাষ্প টার্বাইনটির অবস্থান একটি বিশেষ হলে।

এখন আমরা এই হলটি পরিদর্শন করব। এর দৈর্ঘ্য একটি ফুটবল মাঠের চাইতেও বেশি! বাষ্প যে টার্বাইনটিতে এসে তাকে ঘুরতে বাধ্য করে তার আকার একটি দ্বিতল ভবনের সমান। এই টার্বাইনের ঘূর্ণায়মান ব্লেডগুলো জেনারেটরের অক্ষদণ্ডটিকে ঘুরাতে থাকে এবং যার ফলে উৎপন্ন হয় বিদ্যুৎ। চারদিকের পরিবেশ তাকলাগানোর মতো; কারণ আমরা প্রত্যক্ষ করছি পারমাণবিক বিদ্যুৎ উৎপাদনের অন্য একটি প্রক্রিয়া।

আশ্চর্যজনক ব্যাপার হলো, আমাদের আশপাশে একটি লোকও দেখা যাচ্ছে না। পুরো প্রক্রিয়াটি নিয়ন্ত্রিত হয় কম্পিউটারের সাহায্যে; একটি বিশেষ কক্ষ থেকে। আমরা এখন এ নিয়ন্ত্রণ কক্ষটি ঘুরে দেখব।

এই কক্ষে প্রবেশ করাটা খুব কঠিন একটি ব্যাপার। যাই হোক, আমরা এখন নিয়ন্ত্রণ কক্ষে প্রবেশ করলাম; যেখান থেকে পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রটির কার্যক্রম নিয়ন্ত্রিত হয়। চারদিকে শত শত বাল্ব, সুইচ, কম্পিউটার .....। রিঅ্যাক্টরকে যদি এনার্জি ব্লকের হৃৎপিণ্ড হিসেবে বিবেচনা করা হয় তবে কন্ট্রোল প্যানেলটি হচ্ছে এর ব্রেইন।

কাজে যাতে কোন বিঘ্ন না ঘটে সে জন্য আমাদের এখানে মাত্র কয়েক মিনিট থাকার অনুমতি দেয়া হয়েছে। শব্দ করে কথা বলতেও নিষেধ করা হয়েছে।

তুমি কি জানো একটি পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের একটি এনার্জি ব্লক থেকে কি পরিমাণ বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়? একটি আধুনিক এনার্জি ব্লকের উৎপাদন ক্ষমতা কয়েকশত মেগাওয়াট (১ মেগাওয়াট = ১,০০০ কিলোওয়াট)। আর এই পরিমাণ বিদ্যুৎ কয়েক লক্ষ লোকের বিদ্যুতের চাহিদা পূরণে সক্ষম।

বাংলাদেশের পাবনা জেলার রূপপুরে স্থাপিত হচ্ছে একটি অত্যাধুনিক পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র। চাইলে তুমিও এখানে কাজ করতে পারবে!

পারমাণবিক শক্তি কেন প্রয়োজন?

এ পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র এবং তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের একটি তুলনামূলক চিত্র দেখা যাক। আধুনিক একটি পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের একটি ব্লক থেকে যে পরিমাণ বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয় সমপরিমাণ বিদ্যুৎ পেতে হলে একটি তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রে প্রয়োজন হবে ৫০ লাখ টন কয়লার। ভেবে দেখ যে, প্রতি ৫/৬ ঘণ্টায় তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রটিতে ৫০টি করে রেল ওয়াগন ঢুকছে এবং বেরিয়ে যাচ্ছে। প্রতিটি ওয়াগনে ৬০ টন করে কয়লা। এক বছরে যতগুলো ওয়াগন বিদ্যুৎকেন্দ্রে এলো এবং বেরিয়ে গেল সেগুলোকে যদি একসঙ্গে জোড়া দেয়া হয় তবে তা বাংলাদেশের উত্তর থেকে দক্ষিণ প্রান্ত পর্যন্ত দূরত্বের তিনগুনের বেশি হবে। কয়লা সর্বরাহের পেছনে যে আয়োজন ও পরিশ্রম তার কথা না হয় বাদই দিলাম।

তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রে ব্যবহারের পর এই ৫০ লাখ টন কয়লার একটি বড় অংশ বর্জ্য হিসেবে সংরক্ষণ করতে হয়। ভেবে দেখ, কি পাহাড় পরিমাণ এই বর্জ্যের স্তূপ খোলা আকাশের নিচে পড়ে আছে। এই বর্জ্য কিন্তু মোটেও নিরাপদ নয়। এছাড়াও তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র থেকে শত শত টন ধূলিকণা এবং সালফার ও নাইট্রোজেনের মিশ্রণ চিমনি দিয়ে বের হয়ে বায়ুমণ্ডলে মিশছে প্রতিনিয়ত। ফলশ্রুতিতে আমরা দেখতে পাই অত্যন্ত ক্ষতিকারক এসিড বৃষ্টি।

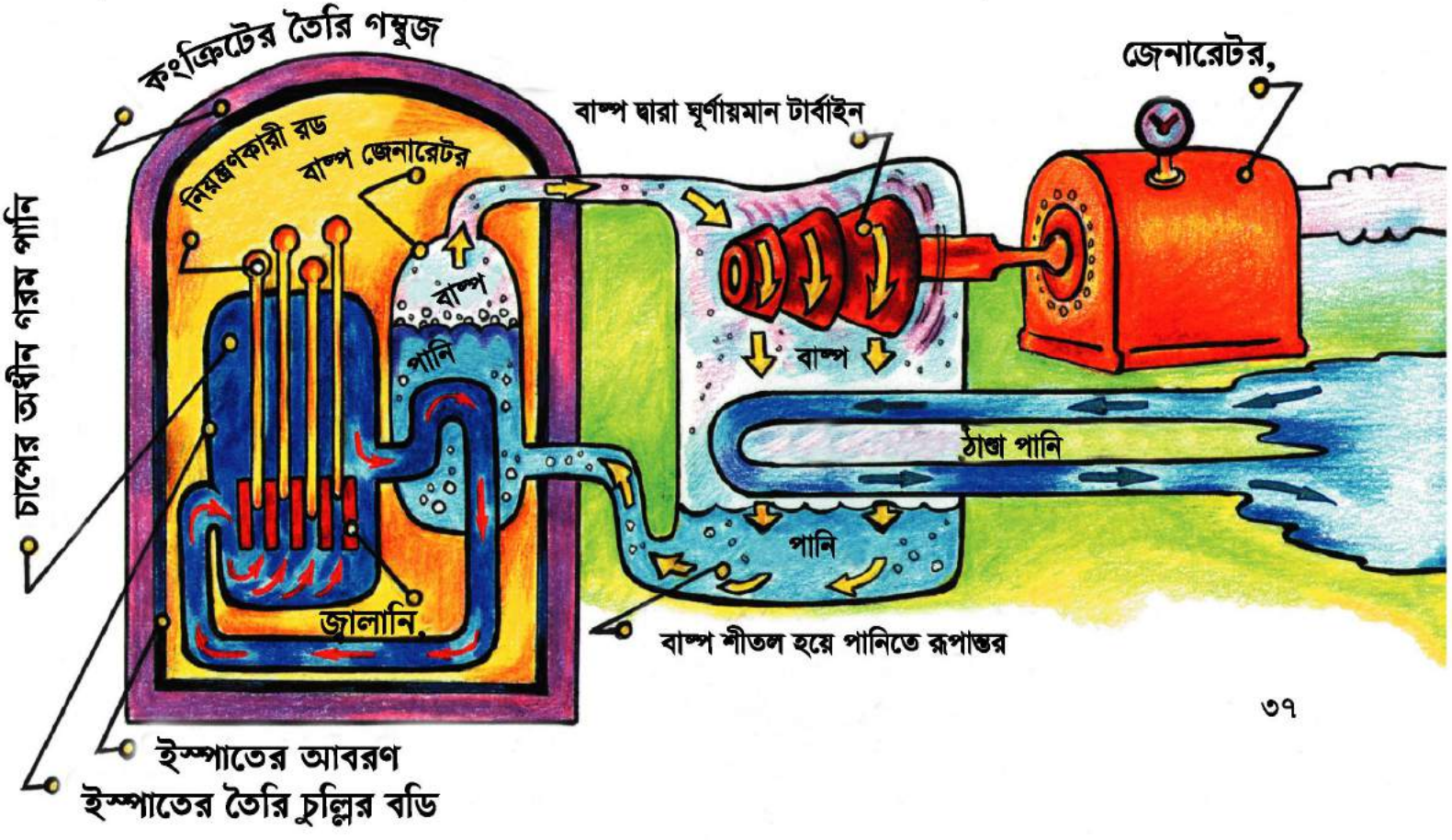

এটাই শেষ নয়। তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের চিমনি দিয়ে বিপুল পরিমাণ কার্বন-ডাইঅক্সাইড গ্যাস বের হয়। কয়লা, গ্যাস বা তেলের দহনের ফলে উৎপন্ন হয় এই গ্যাস। বিজ্ঞানিদের মতে এই গ্যাসের কারণেই সৃষ্ট হয় 'গ্রিনহাউস ইফেক্ট'। এর ফলে পৃথিবীর তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাচ্ছে প্রতিনিয়ত। জলবায়ুর পরিবর্তন ঘটছে এর প্রভাবে; তাই আগের তুলনায় বন্যা, জলচ্ছ্বাস, খরাসহ বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগের সংখ্যা বেড়ে চলেছে। পৃথিবীর গড় তাপমাত্রা যদি ২-৩ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড বৃদ্ধি পায় তবে মেরু অঞ্চলের বরফ গলতে শুরু করবে। সমুদ্র, মহাসাগরে পানির উচ্চতা বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে ইউরোপ, অস্ট্রেলিয়া, আমেরিকার একাংশ এবং অনেক দ্বীপ হয়তো মানচিত্র থেকে হারিয়ে যাবে।

এই বিপদ ঠেকাতে হলে আমাদের এখনই কয়লা বা গ্যাস পোড়ানোর প্রয়োজন হয় না, এনার্জির এমন অলটারনেটিভ বা বিকল্প উৎস ব্যবহার করতে হবে। এই উৎসগুলো হতে পারে পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র, সৌর বিদ্যুৎকেন্দ্র, পানি বিদ্যুৎকেন্দ্র, বায়ুকল ইত্যাদি, যেগুলো থেকে গ্রিনহাউস প্রভাবের কোন সম্ভাবনা নেই।

একারণেই সারা বিশ্বে পারমাণবিক বিদ্যুতের ব্যবহার বাড়তে থাকবে। বাংলাদেশেও একই কারণে তৈরি হচ্ছে পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র। পাবনা জেলায় নির্মিয়মান কেন্দ্রটি সারাদেশের মানুষের কল্যাণ বয়ে আনবে।

পারমাণবিক বিদ্যুতের উৎসকে বর্তমানে নির্ভরযোগ্য ও বিপদমুক্ত হিসেবে বিবেচনা করা হয়। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে কয়েক শতাধিক পারমাণবিক বিদ্যুৎ ইউনিট চালু রয়েছে। এ জাতীয় নতুন নতুন বিদ্যুৎকেন্দ্রের নির্মাণ কাজ চলছে এবং নতুন নতুন প্রকল্প প্রণয়নও করছে বিভিন্ন দেশ।

বিদ্যুতের নতুন কেন্দ্রগুলো থেকে মানুষ আরো বেশি এনার্জি পাবে। এটি একটি চলমান প্রক্রিয়া। এমন নতুন কিছু অবশ্যই আবিষ্কার হবে, যার কথা আমরা আজকে হয়তো কল্পনাও করতে পারছি না। প্রিয় বন্ধু! তুমি যদি মানবকল্যাণে এনার্জির নতুন উৎস সন্ধানের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে কাজ করতে চাও তবে তোমার জন্য খোলা রয়েছে ব্যাপক সম্ভাবনার দ্বার। নিজের সৃজনশীলতা ও দক্ষতা প্রমাণের অনেক সুযোগ রয়েছে তোমার সামনে। তোমার জন্য রইল অনেক শুভকামনা!